তাড়াহুড়োর 'সার্জারি' অথবা '৪৭-এর দেশভাগে ক্ষত-বিক্ষত জীবনের টুকরো টুকরো গল্প*

সাঈদ ফেরদৌস

অনেকের কাছেই মনে হতে পারে যে, ইতিহাসের শাস্ত্রীয় চর্চায় তথ্যগত নির্ভুলতা একটা অত্যাবশ্যকীয় উপাদান; এই কাজের নানা পর্যায়ে আমার কিন্তু তা নিয়ে খুব একটা মাথাব্যথা ছিল না। এই লেখায় আমি ভুল-নির্ভুলের বিভাজনকে, কিংবা আরো সোজাসুজি বললে সত্য-মিথ্যার বিভাজনকে ছাড়িয়ে যেতে চাইব। বিশেষত যখন আমি গুজব কিংবা গল্প নিয়ে কাজ করছি, ভাঙা স্মৃতির টুকরো নিয়ে কাজ করছি; কাজ করছি মানুষজন কী করে বড় ইতিহাসকে নিজেদের ছোট্ট জীবনে জড়িয়ে নেয় তা নিয়ে, নিজেদের একটা স্থানিক ইতিহাস দাঁড় করানোর জন্য তাদের যে বাসনা, তা নিয়ে; তখন সামঞ্জস্যর চাইতে অসামঞ্জস্য, একটা সম্পূর্ণ গল্পের চাইতে অসম্পূর্ণতার দিকেই আমার চোখ থাকবে বেশি।

১. 'সার্জারি'

৩. রেখাটি নিম্নলিখিত থানাগুলোর মধ্যকার সীমানা বরাবর সোজা চলিয়া যাইবে : হরিপুর এবং রায়গঞ্জ; হরিপুর এবং হেমতাবাদ; রাণীশংকৈল এবং হেমতাবাদ; পীরগঞ্জ এবং হেমতাবাদ; পীরগঞ্জ এবং কালীগঞ্জ; বোচাগঞ্জ এবং কালীগঞ্জ; বিরল এবং কালীগঞ্জ; বিরল এবং কুশমুণ্ডী; বিরল এবং গঙ্গারামপুর; দিনাজপুর এবং গঙ্গারামপুর; দিনাজপুর এবং কুমারগঞ্জ; চিরিরবন্দর এবং কুমারগঞ্জ; ফুলবাড়ী এবং কুমারগঞ্জ; ফুলবাড়ী এবং বালুরঘাট। বালুরঘাট থানার পূর্বকোণে যেই স্থলে ফুলবাড়ী এবং বালুরঘাটের মধ্যকার সীমানা বেঙ্গল-আসাম রেলওয়ের উত্তর-দক্ষিণ লাইনের সহিত মিলিত হইবে, সেই স্থলে রেখাটি সমাপ্ত হইবে। অতঃপর রেখাটি রেলওয়ের মালিকানাধীন রেলওয়ে ভূমির পশ্চিম প্রান্ত অভিমুখে বাঁক নিবে এবং উক্ত প্রান্ত বরাবর অগ্রসর হইয়া বালুরঘাট এবং পাঁচবিবি থানাদ্বয়ের মধ্যকার সীমানা রেখার সহিত মিলিবে(জাতিসংঘ, ২০০৬: ৬)।

ব্রিটিশ ভারতের বিভাজন ভারত ও পাকিস্তান নামের দুটো জাতিরাষ্ট্রের জন্ম দিয়ে তাদের নতুন বর্ডার তৈরি করেছিল, যাকে বুদ্ধিবৃত্তিক মহলের ভেতরে-বাইরে অনেকেই 'সার্জারি' নামে ডাকেন। তবে কারো কারো মতে, এই রূপকটি বিভ্রান্তিকর এবং দেশভাগের সর্বনাশা পরিণামকে তা আড়াল করে। এই লেখায় প্রথমত আমি কথিত 'সার্জারি'র সাথে সংশ্লিষ্ট কতগুলো দিক তুলে ধরব আর তারপর বাংলাদেশের একটি বর্ডার এলাকার আটপৌরে জীবন থেকে বর্ডার তৈরির সাথে সম্পর্কিত তিনটি গল্প তুলে এনে দেখাব কিভাবে 'সার্জারি' প্রান্তিক জীবনকে ক্ষত-বিক্ষত করেছে। লেখাটা এও দেখতে সাহায্য করবে যে, ইতিহাসের অতীতকে বুঝতে টুকরো টুকরো গল্পগুলো কী সাংঘাতিক ভূমিকা রাখতে পারে।

> "যে সিদ্ধান্তকে প্রায় সবাই ভুল বলে মনে করে, তার জন্য এত তাড়াহুড়োর কী ছিল? ভারতের সমস্যার একটা ঠিকঠাক সমাধান যদি ১৫ আগস্টের মধ্যে খুঁজে পাওয়া না যায়, কেনই বা একটা ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়া আর পরে তার জন্য বসে বসে দুঃখ করা?"

১.১ তাড়াহুড়োর 'সার্জারি' : গোড়াতেই গলদ

বাউন্ডারি কমিশনের রিপোর্টের উদ্ধৃতাংশ দেখলে যে কারো মনে হতে পারে যে, 'সার্জারি'টা বেশ নিপুণ এবং যথাযথ রকমের নিখুঁতভাবেই সম্পন্ন হয়েছিল; কিন্তু আসলেই কি তাই? জয়া চ্যাটার্জীর (১৯৯৯: ১৯৩) বিচারে, এ বিষয়ে বড়লাটের কৌশলটা *"এমন মনে হচ্ছিলো যে, (তিনি) পুরো সময়টা তাড়ার মধ্যে রেখে কাউকে মুহূর্তকাল থেমে ভাববার অবকাশটুকু দেবেন না।"* ভারতীয় রাজনৈতিক নেতারাও বোধ করি একটা দ্রুত বন্দোবস্তের মধ্য দিয়ে সম্ভাব্য নগদ-প্রাপ্তির লোভে পড়ে বড়লাটের সাথে তাল দিয়েছিলেন। যদিও চ্যাটার্জি জোরেশোরেই দাবি করেন যে, বাউন্ডারি কমিশন প্রসঙ্গে মাউন্টব্যাটেন পদে পদে নেহরুর পরামর্শ নিতে ব্যাকুল ছিলেন। আর নেহরু হচ্ছেন সেই লোক, যাঁকে দেখে মনে হতে পারে যে, তিনি বিশেষভাবে তাড়ার মধ্যে ছিলেন; তাঁর বিবেচনায় ছিল, *"সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলোর জনগণের ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করতে গেলে সেটা হবে একটা দীর্ঘ প্রক্রিয়ার ব্যাপার"* (পূর্বোক্ত)। ফলে এরকম অবস্থায়, আধাখেঁচড়া, জোড়াতালি দেওয়া গোছের একটা বর্ডার এঁকে দেওয়া বাদে অন্য কোনো সুচিন্তিত পরিকল্পনা কখনোই ছিল না (হডসন, ১৯৮৫: ৩৩৭-৩৩৮)।

এই তাড়াহুড়োর মধ্যে ঔপনিবেশিক সরকার একটা নতুন ধারণা উদ্ভাবন করে, 'নোশ্যনাল বাউন্ডারি' বা ধারণাগত বর্ডার (শ্যাণ্ডেল, ২০০৫: ৩৯-৫২)। এই 'ধারণা'র ভিত্তি ছিল ১৮ জুলাই ১৯৪৭-এর ভারতীয় স্বাধীনতা অ্যাক্ট, যাতে বাংলার জেলাগুলোর তালিকা ধরে সেগুলোকে 'সাময়িকভাবে নতুন প্রদেশ পূর্ববঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা হয়' এবং এর ফলে তাদের পাকিস্তানের অংশে পরিণত হবার কথা। অথচ বাস্তবতা হলো ওইসব জেলার অনেকগুলোই পুরোপুরিভাবে কিংবা অংশত পাকিস্তানের মধ্যে পড়েনি (পূর্বোক্তঃ ৫১)। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেবার আগে প্রশাসক ও রাজনীতিবিদদের খসড়া একটা ধারণায় একমত হবার কথা ছিল, যার ভিত্তিতে কমিশন বর্ডার ঠিক করে দেবে।

অথচ মানুষজন ছিল অন্ধকারে। তাদের কোনো ধারণাই ছিল না তাদের জীবনে কী ঘটতে যাচ্ছে সে বিষয়ে। পরিস্থিতি আরো খারাপ হয়ে ওঠে, যখন বড়লাট সীমান্তের নকশাটা ১৩ আগস্ট পর্যন্ত গোপন রাখার সিদ্ধান্ত নেন এবং তার চেয়ে ভয়াবহ হলো যখন দুটো নতুন দেশের আত্মপ্রকাশেরও পরে ১৭ আগস্টে এসে তা প্রকাশ করা হয়[১] (পূর্বোক্তঃ ৫১-৫২)। তো, সেই 'সার্জারি' কেমন ছিল? তাড়ার ব্যাপারটা কমিশনের জন্যই বা কেমন ছিল?

> লাখো মানুষের তকদির ঠিক করতে কাজে নাইমা পড়লেন
> তিনি। তেনার হাতে থাকা ম্যাপগুলো ছিলো তামাদি আর
> জরিপের ফলগুলো ছিলো ভুলে ভর্তি, কিন্তু অতশত দেখার
> সময় কই, সময় কই ঝামেলার জায়গাগুলো ঘুইরা দেখার।
> আবহাওয়াটা ছিলো সেই রকমের গরম। আর আমাশয়ের
> সাথে যুদ্ধটাও তেনারে দৌড়ের ওপর রাখসিলো, তবু
> সাত সপ্তায়-ই কেল্লা ফতে, বর্ডার নির্ধারণ করা শ্যাষ,
> ভালো হইলো কি মন্দ, ভাগ হইয়া গেলো একখান দ্যাশ।
> (পূর্বোক্তঃ ৭৪)

ঘটনার অনেক বছর পরে, পাঞ্জাব আর বাংলা দুই বাউন্ডারি

কমিশনের চেয়ারম্যান সিরিল র‍্যাডক্লিফ এক সাক্ষাৎকারে বলেন, *"আমি এমন তাড়ায় ছিলাম যে, খুঁটিনাটি বিস্তারিত দেখার সময় আমার ছিল না ...দেড় মাসে আমি কী-ই বা করতে পারতাম?"* কমিশনের ঘাড়ে ছিল অসম্ভব একটা দায়িত্ব (নায়ার, ১৯৭২: ৩৫)। তদবিরবাজ আর প্রেশার গ্রুপগুলোর সাথে বসাবসি বাদেও তাদেরকে একটা অস্পষ্ট নির্দেশনা আর মাত্র ছয় সপ্তাহের সময়সীমা মেনে নিতে হয়েছিল (শ্যাণ্ডেল, ২০০৫: ৭৪)। এ-সংক্রান্ত কোনো পূর্বতন নজির কিংবা ভাগাভাগির প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করার কোনো নীলনকশা তাদের হাতে ছিল না; কাজের বেশিরভাগটাই ছিল তাৎক্ষণিক। কারো কারো পূর্বানুমান ছিল যে, পুরো বর্ডার নির্ধারণের ব্যাপারটা ছিল র‍্যাডক্লিফের একক কৃতিত্ব–এ নিয়ে পরবর্তীকালের গবেষকরা প্রায় কোনো প্রশ্নই তোলেননি; অথচ বাস্তবতা ছিল তার চেয়ে একেবারেই ভিন্ন। মাউন্টব্যাটেন এবং কংগ্রেস নেতৃত্ব কাজের মধ্যে হস্তক্ষেপ করতেন আর প্রায়শই তাঁরা এ কাজে র‍্যাডক্লিফকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতেন (চ্যাটার্জী, ২০০৭: ২০)।

তবে মনে রাখা জরুরি যে, সকলে একই রকম তাড়ায় ছিলেন না। কোনো কোনো ভারতীয় রাজনীতিবিদ, কিছু ব্রিটিশ প্রশাসক পরিস্থিতির ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক করেছিলেন। তখনকার পাঞ্জাবের গভর্নর ইভান জেঙ্কিন্স, যাঁকে অনেকেই ব্রিটিশ প্রশাসকদের মধ্যে সবচেয়ে দক্ষ বলে মনে করেন, তিনি পরিষ্কার সতর্কবাণী করেছিলেন। মৌলানা আজাদ (১৯৮৮: ২২৬) বলেছিলেন, *"যে সিদ্ধান্তকে প্রায় সবাই ভুল বলে মনে করে, তার জন্য এত তাড়াহুড়োর কী ছিল? ভারতের সমস্যার একটা ঠিকঠাক সমাধান যদি ১৫ আগস্টের মধ্যে খুঁজে পাওয়া না যায়, কেনই বা একটা ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়া আর পরে তার জন্য বসে বসে দুঃখ করা?"* কিন্তু সিদ্ধান্ত তো নেওয়া হয়ে গেল। কী ছিল তার পরিণাম?

অস্পষ্টতার জায়গা আর অগোছালো দর-কষাকষি

বড়লাট কমিশনকে যে নির্দেশনা দিয়েছিলেন, সেটা ছিল, *"মুসলিম এবং অ-মুসলিম সংযুক্ত এলাকাসমূহকে বিবেচনায় রাখিয়া তার ভিত্তিতে বাংলার দুই অংশের সীমানাকে বিভক্ত করা হউক। এই ক্ষেত্রে অন্যান্য বিষয়গুলোকেও বিবেচনায় রাখা হইবে।"* (রেডকিফ, ১৯৪৭: ১; উদ্বৃত চ্যাটার্জী, ২০০৭: ৩০; শ্যান্ডেল, ২০০৫: ৩৯)। চ্যাটার্জী (১৯৯৯: ১৯৩ ; ২০০৭:৩০) বলেন, অন্য অনেক কিছুর মতো এটাও ছিল মাউন্টব্যাটেনের প্রতি নেহরুর দেওয়া আরেকটা পরামর্শ।

এই নির্দেশনাটায় দুটো অস্পষ্ট জায়গা আছে। প্রথমটা হলো 'এলাকা' (এরিয়া) শব্দটার ব্যবহার। পূর্ববাংলায় বড় থেকে ছোট বিবিধ প্রশাসনিক একক ছিল, যার যেকোনোটার ক্ষেত্রেই 'এলাকা' কথাটা ব্যবহার করা যায়।[২] কংগ্রেস মনোনীত কমিশনের অমুসলিম সদস্যরা চাইছিলেন থানা হবে ভাগাভাগির একক আর লীগ মনোনীত মুসলিম সদস্যদের পছন্দ ছিল ইউনিয়ন। চ্যাটার্জি অবশ্য বলেন যে, লীগের পক্ষ থেকে ইউনিয়ন অথবা মহকুমার কথা বলা হয়েছিল। এই পছন্দের সাথে যুক্ত ছিল বেশি জায়গা বাগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা।

নির্দেশনায় যে 'অন্যান্য বিষয়গুলো'র (আদার ফ্যাক্টর) কথা বলা হয়েছিল, তা নিয়েও অস্পষ্টতা ছিল। এমনকি অনুরোধ সত্ত্বেও কমিশন এ প্রসঙ্গে বড়লাটের কোনো বিশদ ব্যাখ্যা পায়নি; বরং বিষয়টাকে ইচ্ছা করেই অস্পষ্ট রাখা হয়েছিল। 'সংযুক্ত', মানে লাগোয়া এলাকার নিয়মটা যদি মেনে চলা হতো, বাংলার বিভাজন হয়তো আরেকটু সহজভাবে করা যেত। কিন্তু 'অন্যান্য বিষয়গুলো'ই বড় হয়ে উঠল, কেননা লীগের প্রতিনিধিরা নিজেদের জন্য সর্বোচ্চ জায়গা বাগানোর চেষ্টায় ওটা ধরেই প্যাঁচ কষতে থাকলেন; কংগ্রেসও তার দেওয়া দুটো প্রস্তাবের মধ্যে একটিতে একইভাবে ওটা নিয়ে খেলছিল (চ্যাটার্জী, ১৯৯৯:১৯৮,২০৫)। ফল হলো, বেশিরভাগ জায়গাতেই বর্ডার মুসলিম কিংবা অমুসলিম-এর লাগোয়া এলাকাগুলো ধরে ভাগটি করতে পারল না। ভান স্কেন্ডেল দেখিয়েছেন, অর্ধেকেরও বেশি জায়গায় বর্ডার এমন এলাকাগুলোকে বিভক্ত করল, যেখানে মুসলিম কি অমুসলিম যেকোনো একটা অভিন্ন ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ বাস করে এবং তারা সীমান্তের দুই দিকে পড়ে গেল। তিনি আরো দেখান, সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, বাউন্ডারি কমিশন বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করেছে, কিন্তু আসলে তা প্রদেশটাকে বড় বড় চার টুকরোয় ভাগ করেছে; আর তার ওপর তৈরি করে দিয়েছিল ১৯৭টা ছিটমহল (শ্যান্ডেল, ২০০৫: ৪৩-৪৭)। 'সার্জারি' মানুষের বাস্তবিক জীবনে কী ক্ষয়ক্ষতি করেছে তা যদি বাদও দিই, যুক্তির পরিসরেও আমরা দেখতে পাই যে ব্যাপারটা মোটেই গোছালো ছিল না।

কমিশনের অদক্ষতা

সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, বাউন্ডারি কমিশন বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করেছে, কিন্তু আসলে তা প্রদেশটাকে বড় বড় চার টুকরোয় ভাগ করেছে; আর তার ওপর তৈরি করে দিয়েছিল ১৯৭ টা ছিটমহল।

দুই তরফ থেকেই দর-কষাকষির ব্যাপারটা অনিবার্যভাবেই চলছিল যার যার সম্প্রদায়ের নামে। অথচ কমিশন সম্প্রদায়ের কথা শুনতে মোটেও খুব একটা তৈরি ছিল না। গণশুনানি হয়েছিল কলকাতায় আর সেখানে কেবল বড় রাজনৈতিক দলগুলোর আপিলই বিবেচনায় নেওয়া হয়েছিল। তার ওপর যাঁর ঘাড়ে দায়িত্বটা ছিল, তিনি যে জায়গায় কাজ করছেন, না জানতেন সেখানকার ভূগোল বা সংস্কৃতি, না জানতেন মাঠে-ময়দানে কি সম্ভাব্য ইস্যুর মুখোমুখি তাঁকে হতে হবে[৩] (চ্যাটার্জী, ১৯৯৯ঃ ২২০-৫)। ভাবুন একবার 'সার্জারি'টা কেমন ছিল, যেখানে সার্জনের অ্যানাটমি, ফিজিওলজি, এমনকি খোদ রোগটি সম্পর্কেও কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই। পুরোপুরি অবাস্তব, ত্রুটিপূর্ণ প্রয়াস আর কি। দু-একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। থানাকে বিভাজনের একক হিসেবে বাছাই করার ফলে ক্রিমিনোলজিক্যাল ম্যাপ অনুসরণ করতে হয়েছিল, অথচ বহু ক্ষেত্রেই তার সাথে সেটেলমেন্ট ম্যাপের গরমিল দেখা যায়। কোথাও কোথাও আবার তাঁরা প্রাকৃতিক নিদর্শন/চিহ্নকে সীমান্তের সাথে এক করে ফেলেছিলেন; কিন্তু ধরা যাক, ঋতু বদলের সাথে সাথে নদীর গতিপথও বদলায় এবং এই রকমটা ঘটায় তা বর্ডার বিরোধেও ভূমিকা রাখে।[৪] এমন সব অস্পষ্টতা থেকেই পরের দশকগুলো জুড়ে বিভ্রান্তির জের চলতে থাকল, যা নিয়ে প্রতিবেশী দেশগুলো আজ অব্দি ধস্তাধস্তি করে চলেছে।

নিচুতলায় 'সার্জারি'র পরিণাম

অগোছালো এই 'সার্জারি' নিয়ে নিচের সারির মানুষজনও মোটেই স্বস্তিতে ছিল না। ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে তাদের সামান্যই ধারণা ছিল, কিংবা বলা যায় কোনো ধারণাই ছিল না; তারা ছিল পুরোপুরি বিভ্রান্ত। মানুষের মধ্যে সারাক্ষণই একটা ভয় ছিল যে, তারা আবার না ভুল জায়গায় পড়ে যায়; ভুল মানুষে পরিণত না হয়। জায়গায় জায়গায় তাই সীমান্তের সম্ভাব্য বিন্যাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সমাবেশ

হচ্ছিল। হিন্দুপ্রধান জেলা খুলনার হিন্দুদের মনে হয়েছিল, মুসলিমপ্রধান মুর্শিদাবাদকে ভারতে রাখার বিনিময়ে তাদেরকে পাকিস্তানে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে স্থানীয় কংগ্রেসের নেতারা মুর্শিদাবাদের সাথে তাদের জেলাকে বিনিময়ের আরজি করে একটা দরখাস্ত দেন। অবধারিতভাবেই মুর্শিদাবাদের হিন্দু নেতৃত্বের এই আরজিতে খুশি হবার কোনো কারণ নেই। অন্যদিকে মুর্শিদাবাদের মুসলমানরা তাদের ভারতে অন্তর্ভুক্তি নিয়ে প্রচণ্ড অখুশি ছিল। ঠিক যেমন অখুশি ছিল দিনাজপুর কিংবা জলপাইগুঁড়ির যে অংশগুলো পূর্ববঙ্গে পড়েছিল, সেখানকার হিন্দুরা। করিমপুর থানার মুসলমানরা ভীষণভাবে আশা করেছিল যে তারা পাকিস্তানের মধ্যে পড়বে, কিন্তু বাস্তবে হলো উল্টোটা। এই গল্পের কোনো শেষ নেই। ভুল জায়গায় আটকে পড়া ভুল মানুষের নাখোশিই গল্পের সবটা নয়। যে মানুষরা ঠিক জায়গাতেও ছিল, যাদের আপাত অর্থে সংখ্যালঘু হয়ে পড়ার কোনো ভয় ছিল না, তারাও যেভাবে ভাগাভাগিটা সম্পন্ন হলো, তা নিয়ে খুশি ছিল না।

১.২ চ্যালেঞ্জের মুখে 'সার্জারি'র রূপক

প্রশ্ন হলো, যখন আমরা 'সার্জারি'র রূপকটা ব্যবহার করি, তখন কি তা দেশভাগের এমন বিশৃঙ্খল, অগোছালো, ত্রুটিপূর্ণ, বিপর্যয় ডেকে আনা, সহিংস এবং অসম্পূর্ণ চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরে, যেমনটা আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম? চ্যাটার্জির মতে, বহুল ব্যবহৃত এই তুলনাটি দেশভাগের ঔপনিবেশিক এবং জাতীয়তাবাদী বয়ানের সাথে খাপে খাপে মিলে যায়। অন্যভাবে বলা যায়, এমন একটা রূপকের ব্যবহার দেশভাগের সময় যা কিছু ঘটেছে তাকে বৈধতা দেয় এবং গ্রহণযোগ্য করে তোলে। রূপকটি সম্পর্কে আলোচনা শুরু করতে গিয়ে তিনি বলেন, ব্রিটিশরা দেশভাগ প্রসঙ্গে নিজেদের যে চিকিৎসক/বিজ্ঞানীসুলভ দূরত্ব দেখাতে চায়, তার সাথে 'সার্জারি' ধারণাটি সংগতিপূর্ণ। জাতিকে মানবদেহের মতো করে দেখানোর সাথেও এটি মানানসই। ভারতীয় প্রেক্ষিত থেকে পাকিস্তান হলো সেই রোগাক্রান্ত হাত বা পা, যাকে কেটে ফেলতে হয়েছিল। চ্যাটার্জি মনে করেন, এই রূপকের ব্যবহার বিভ্রান্তিকর, কেননা তা থেকে মনে হতে পারে যে, সুস্থ হবার জন্য দেশভাগ নামক 'সার্জারি'টি না করে কোনো উপায় ছিল না (চ্যাটার্জী, ১৯৯৯: ১৮৫)। কিন্তু বাস্তবে উপমহাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক গতিপ্রকৃতি আমাদেরকে উল্টো কথা বলে।

> ভাবুন একবার 'সার্জারি'টা কেমন ছিল, যেখানে সার্জনের অ্যানাটমি, ফিজিওলজি, এমনকি খোদ রোগটি সম্পর্কেও কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই।

রূপকটির প্রয়োগ দেশভাগকে 'একটানে নিখুঁতভাবে করা একটা পরিচ্ছন্ন অপারেশন, একটা একক, সুসম্পন্ন প্রক্রিয়া' হিসেবে দেখার যে প্রবণতা, তার সাথে হবহু মিলে যায়। *"ভাবা হয়েছিল যে, সব খোলা মুখটুখ সেলাই করে অপারেশনটা শেষ করা হয়েছিলো...১৯৪৭ এর ১৭ই আগস্ট"* (চ্যাটার্জী,১৯৯৯: ১৮৬)। বাউন্ডারি কমিশনের কীর্তিকলাপ, যা আমি একটু আগে বলেছি, তা কিন্তু অন্য ধারণা দেয়। কমিশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া এবং তার দীর্ঘসূত্রী পরিণাম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে চ্যাটার্জি (পূর্বোক্ত) এই সিদ্ধান্তে পৌছেন যে, *"দেশভাগ কোন অর্থেই এমন কোন অপারেশন ছিলো না, যা ১৯৪৭ এর আগস্টে শেষ হয়েছে। বর্ডার কোনভাবেই...একটা সেরে ওঠা, মিলিয়ে যেতে থাকা কাটার দাগ নয়।"* তাঁর মতে, ক্ষতটা এখনো বড় হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় আছে। দেশভাগ হলো তেমনই এক প্রক্রিয়া, যা এখনো ক্রমশ খুলছে।

রূপকটি থেকে আরো মনে হতে পারে যে, দেশভাগ ছিল ভারতের প্রতি সংঘটিত অন্যায়, যেখানে ভারত ছিল সার্জনের ছুরির তলায় শোয়ানো নিষ্ক্রিয় সত্তা। অর্থাৎ ঘটনা এবং তার পরিণতিতে ভারতের কোনো দায় নেই। এই মতও ইতিহাসের জাতীয়তাবাদী স্বরের সাথে সংগতিপূর্ণ (চ্যাটার্জী,১৯৯৯: ২৪২)। এতে সহজেই 'অন্যের' ঘাড়ে দায় চাপানো যায়; ভারতের সেই 'অন্য' হচ্ছে ব্রিটিশ, জিন্নাহ কিংবা তার মুসলিম লীগ। অথচ ওপরের আলোচনা দেখায়, হিন্দু-মুসলিম উভয় পক্ষের শীর্ষ পর্যায়ের কুশীলবরাই ভীষণভাবে সক্রিয় ছিলেন; দর-কষাকষিতে ব্যস্ত ছিলেন। কেউ কেউ এতটাই প্রভাবশালী ছিলেন যে, তাঁদেরকে উপেক্ষা করা ছিল অসম্ভব এবং তাঁদের প্রভাব বাউন্ডারি কমিশনের কাজে রয়ে গেছে।

রাজনৈতিক এলিট এবং তাদের ব্রিটিশ প্রতিপক্ষ যথা–বড়লাট, এঁদের এতসব ভূমিকা দেখলে বোঝা যায় যে, 'সার্জারি'র রূপকটি যে মোটেও যথাযথ নয়। কাজটা আদতে যদি টেকনিক্যালই হয়ে থাকে, তাহলে চ্যাটার্জির মত মেনে নিয়ে প্রথমেই বলতে হবে যে, অভিজ্ঞতা আর পূর্ব-ইতিহাস বিচারে, কমিশনের চেয়ারম্যান বাছাইটা ছিল বড় ভুল।[৫] আবার এমনকি সাম্প্রতিক সময়েও কি আমলারা, কি ইতিহাসবিদরা দাবি করে থাকেন যে, দেশভাগের কাজটা ছিল একটা দল-নিরপেক্ষ, প্রশাসনিক বিষয়। অথচ কমিশনের গঠন, তৎপরতা এবং দু'পক্ষের দর-কষাকষি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে চ্যাটার্জি এই উপসংহারে পৌছেন যে, *"বর্ডার নির্মোহভাবে, নিখুঁতভাবে, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়গুলোর দিকে লক্ষ্য রেখে আঁকা হয়নি। তা ছিলো তাড়াহুড়ো করে এবং মূর্খের মতো করে আঁকানো রেখা, যার খসড়া তৈরিতে রাজনৈতিক চাপের বড় ভূমিকা ছিলো"* (চ্যাটার্জী,১৯৯৯: ২৪২; ২০০৭ঃ ২৪-৬০)। ইতিহাসবিদরা এ বিষয়ে একমত যে, সিরিল র‍্যাডক্লিফ যে চূড়ান্ত নকশাটা প্রণয়ন করেন, তার সাথে কংগ্রেসের প্রস্তাবিত পরিকল্পনার অনেক মিল; কেউ কেউ এমনকি এও বলতে চান যে, কংগ্রেস যা চেয়েছে, র‍্যাডক্লিফ তা-ই দিয়েছেন, তাঁর নিজের চিন্তার কোনো নমুনা নকশাটায় ছিল না (পূর্বোক্ত,১৯৯৯: ২১৬; ২০০৭: ৫৯-৬০)। এই আলোচনা কয়েকটি প্রতিষ্ঠিত ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে–দেশভাগের প্রক্রিয়াটি মোটেই নিছক টেকনিক্যাল ছিল না, বরং তার সাথে ভীষণভাবে মিশে ছিল রাজনৈতিক তদবির আর দর-কষাকষি; প্রক্রিয়াটিতে ভারতীয় কুশীলবদের তৎপর উপস্থিতি ছিল, কাজেই ফলাফলের দায় তাঁদের ঘাড়েও বর্তায়–তারা নিষ্ক্রিয়, পরিস্থিতির শিকার মাত্র ছিলেন না; আর শেষ কথা হলো, ব্রিটিশদের দল-নিরপেক্ষতার দাবিটিও খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। সুতরাং বলা যায়, বর্ডার তৈরির কাজটি ছিল নানা হিসাব-নিকাশের ফল, যার সাথে সম্প্রদায়, এমনকি জাতীয় স্বার্থেরও সামান্যই সম্পর্ক ছিল। বরং দল, উপদল, ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা, কি আঞ্চলিকতা–এসব খাঁড়ার তলায় কাটা পড়ে সম্প্রদায়গত সংহতি (পূর্বোক্ত,১৯৯৯: ২৪১); অথচ এই সম্প্রদায়ের নামেই দেশ ভাগ করা হয়েছিল!

২. হিলি ভাগ হলো

এতক্ষণ বলছিলাম কাটাছেঁড়ার প্রক্রিয়া নিয়ে; এবার আমি দেখাব তাড়াহুড়োর 'সার্জারি' কিভাবে নিচুতলার আমজনতার জীবনকে তছনছ করে। উত্তর-পশ্চিম বাংলাদেশের বর্ডার ঘেঁষা ছোট্ট শহর হিলিতে আমি আমার গবেষণার প্রত্যক্ষণমূলক কাজটুকু করি। হিলি ভাগাভাগির সময় বর্ডার দিয়ে দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল। তার আগে, যেমনটা

অন্য সব জায়গায় ঘটেছিল, ভাগাভাগিতে জনপদটির ভাগ্য নির্ধারণের জন্য হিলিতেও একটা গণভোট হয়েছিল। ভোটের ফলের ভিত্তিতে একটা ম্যাপ বিলি করা হয়, যাতে দেখা যায় পুরো জনপদটাই ছিল মুসলিমপ্রধান এলাকা। কাজেই মানুষজনের মনে হয়েছিল, হিলি হয়তো বা পাকিস্তানে পড়বে। কিন্তু দেশভাগ যখন হলো, ঘটল একেবারেই অন্য কিছু।

ত্রিমোহিনী থেকে হিলি : বদলে যাওয়া বর্ডার?

বর্ডার-রচনা বিষয়ক গল্পগুলোর যে নানা বিবরণী পাওয়া যায়, তার সবগুলোতেই বলা হয় যে, দেশভাগের মুহূর্তে হিলি ছিল অবিভক্ত আর তার পুরোটাই পড়েছিল পাকিস্তানের মধ্যে। স্থানীয়দের অনেকেরই মতে, শুরুতে বর্ডার ছিল ত্রিমোহিনী (মানুষের মুখের ভাষায় তীরমহানী বা তীরমনি, এখন ভারতের মধ্যে পড়েছে) নামের একটা জায়গায়, যা ছিল এখনকার বর্ডার থেকে মাইল পাঁচেক পশ্চিমে। জায়গাটার নাম আর এখনকার বর্ডার থেকে তার দূরত্ব বিষয়ে ভিন্ন মত রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, ত্রিমোহিনী নয়, জায়গাটা ছিল তিওর, এখনকার হিলি বর্ডার থেকে আনুমানিক আট মাইল পশ্চিমে, কেউ জায়গাটার নাম বলেন ভোলাখালী/ভোলাখাঁড়ি। যে জায়গায়ই হোক না কেন, একটা পাকিস্তানি পতাকা ওঠানো হয়েছিল, যা একটা সময় পরে নামিয়ে নেওয়া হয়। সেই সময় নিয়েও তর্ক আছে; কেউ বলেন এক, কেউ বলেন তিন আবার অন্যরা বলেন সাত দিনের জন্য পতাকাটা উড়েছিল। যা-ই ঘটুক না কেন, পতাকাটা নামিয়ে নিতে হয়েছিল এবং আশপাশের মৌজার সাথে হিলি দুই টুকরো হয়েছিল, মানুষজন টুকরো দুটোকে 'ইন্ডিয়ান হিলি' আর 'পাক হিলি' নামে ডাকে।

এই গল্পের কোনো শেষ নেই। ভুল জায়গায় আটকে পড়া ভুল মানুষের নাখোশিই গল্পের সবটা নয়।

এ বিষয়ে প্রশাসনিক কোনো দিকনির্দেশনা কি ছিল? কেন কিংবা কিভাবে পতাকা ওঠানো হলো, আর পরে কেমন করেই বা তা নামানো হলো? স্থানীয়রা কী করে জানল যে বর্ডার সরে এসেছে? এর প্রধান কারিগর কারা ছিলেন? আর সবচেয়ে বড় কথা হলো, সীমানারেখার এই স্থান বদল নিয়ে মানুষজনের অনুভূতি কেমন ছিল? ঘরে ঘরে তো আর রেডিও ছিল না আর যদি থাকতও, রেডিওর সম্প্রচারে স্থানীয় কিংবা আঞ্চলিক খুঁটিনাটি বিষয়গুলো আসত না বললেই চলে। হিলির কোনো স্থানীয় কুশীলবের কি 'নোশ্যনাল বর্ডার' সংক্রান্ত প্রশাসনিক বা রাজনৈতিক দর-কষাকষিতে কোনো ভূমিকা ছিল? এইসব খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে কোনো প্রামাণ্য দলিলপত্র না থাকায় বর্ডার রচনা নিয়ে মানুষের মুখে মুখে ফেরে যেসব গল্প, সেগুলো সামনে চলে আসে।

পার্টিশনের উষালগ্নে হিলি যখন অবিভক্ত ছিল আর সীমান্তরেখা ছিল এখনকার জায়গা থেকে কয়েক মাইল দূরে, সেখান থেকেই গল্পের শুরু। গল্পগুলো বলে, স্থানীয় হিন্দুরা সীমান্তের এই বিন্যাসে অখুশি ছিল এবং তাদের চেষ্টায়ই বর্ডারের গতিপথ বদলে যায়। আজকের হিলিতে বসবাসকারী মুসলমানদের একটা বড় অংশ বিশ্বাস করে যে, স্থানীয় মুসলমান নেতাদের কেউ কেউ না হলেও অন্তত একজন বর্ডার বদলে যাওয়ার এই প্রক্রিয়ায় জড়িত ছিলেন।

২.১ আজগুবি গল্প, অভিযোগের গল্প

নিরুপায় হিন্দুরা স্থানীয় প্রভাবশালী কংগ্রেস নেতা আফতাব উদ্দিন চৌধুরীকে অনুরোধ করল সীমান্তরেখা বদলে দেবার উদ্যোগ নিতে; তিনি তাদের কথা রেখেছিলেন। কেউ কেউ এমনও বলেন যে, এই কাজ করে দেওয়ার মধ্যে চৌধুরীর বৈষয়িক লাভের ব্যাপারও ছিল। তবে নির্দিষ্ট করে জানতে চাইলে লোকে বলে, তারা এটা শুনেছে, কোনো প্রমাণ তাদের হাতে নেই। গল্পের আরো একটু অংশ হলো ঘটনাটির সাথে আফতাব উদ্দিন চৌধুরীর শারীরিক বৈকল্যের যোগসূত্রতা। কারো কারো মতে, হিন্দুদের দাবিমাফিক একটা নথি তিনি তৈরি করে তাতে স্বাক্ষর করেন। গল্পটার একটা বিবরণী অনুসারে যে মুহূর্তে চৌধুরী কাগজটায় সই করেন, সে মুহূর্তেই তাঁর হাত অসাড় হয়ে যায়। গল্পের অন্য বিবরণী অনুযায়ী, তিনি যখন ডান হাতের তর্জনী উঠিয়ে পরিবর্তিত সীমান্তরেখা দেখাচ্ছিলেন, তার পরপরই হাতটি অচল হয়ে যায়। আমি একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, *"এ রকমটা যে ঘটছিল, আপনি কি নিশ্চিত?"* উত্তরে তিনি হাসছিলেন; হাসিটি এমন ছিল যে তা থেকে হ্যাঁ-না যেকোনো দিকেই যাওয়া যায়; তিনি স্বীকার-অস্বীকার কোনোটিই করেননি। তিনি যোগ করেন, *"এইটা কাকতালীয়ও হতে পারে, তাঁর হয়তো (আগে থেকেই) অসুখ ছিল..."* আমি চাপাচাপি করতেই থাকি, *"আসলেই কি এরকম কিছু ঘটছিল, না ঘটেনি, আপনি কি জানেন?" "না"*, তিনি এবারে বললেন, *"...লোকে এরকম বলে, কিন্তু এটা সত্য যে তাঁর (হাত) প্যারালাইজড হয়ে গেছিল, সেটা আমি দেখেছি।"*

আসল কথায় আসি। সীমান্তের স্থান বদলে যাবার সাথে কারো হাত বিকল হয়ে যাবার কোনো যোগসূত্র থাকতে পারে, আমি এমন কিছু বিশ্বাস করি না। কিন্তু কথা হলো, আমার (পড়ুন বহিরাগতের/গবেষকের) যুক্তিবোধ কি মানুষজনের বিশ্বাস কিংবা জবানির চাইতে বড় ব্যাপার হওয়া বাঞ্ছনীয়? উপরন্তু প্রয়াত আফতাব উদ্দিন চৌধুরীর প্রতিও অবিচার করা হবে, যদি বলা হয় যে, সমাজের সকলেই তাঁর সম্পর্কে এই গল্পটা বিশ্বাস করে। বরং আমি হিলিতে নানা ধরনের মানুষের সাথে কথা বলে দেখেছি, অনেকেই তাঁকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করে; এই গল্পটা তাদের কাছে গুজব ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু সেক্ষেত্রে একটা বড় ভাবনার জায়গা হলো, কেন মানুষজন এমন আজগুবি গল্প এতগুলো বছর ধরে লালন করছে! এমন এক অসম্ভবপরতা এটি, যাকে কেবল সত্য-মিথ্যার ছাঁকনি দিয়ে বোঝা যায় না। এটি এমন অবিশ্বাসযোগ্যতা, যা গবেষকের পক্ষে ধারণ করা কঠিন। পরে যতবার ভেবেছি, আমার নিজের জন্য করুণা হচ্ছিল। কেন আমি একটা স্পষ্ট উত্তরের জন্য মানুষজনকে চাপাচাপি করছিলাম? আমার আগ্রহ আসলে কী নিয়ে ছিল? আমি কি জানতে চাচ্ছিলাম যে, চৌধুরীর হাতে/আঙুলে আসলে কী হয়েছে, কিভাবে হয়েছে? নাকি সীমান্তের স্থানবদল আর চৌধুরীর পক্ষাঘাতগ্রস্ততার মাঝে কোনো যোগাযোগ থাকা যে অসম্ভব, আমি সেটাই শুনতে চাচ্ছিলাম?

যাঁকে নিয়ে এত কথা, তিনি নিজে স্মৃতিকথায় লিখেছেন, *"র‍্যাড ক্লীপের কুঠার হিলি বন্দরকেও দ্বিধাবিভক্ত করিয়া দিল। ন্যায় বিচার অনুযায়ী যে সীমানা হিলি ও বালুর ঘাটের মাঝ দিয়া চলিয়া যাইত কি কারণে জানি না উহা একটি পকেট সৃষ্টি করিয়া হিলি বন্দরটি হিন্দুস্থানের কুক্ষিগত করিল" (চৌধুরী, ১৯৭০: ২০২-০৩)।*

চৌধুরী (১৯৭০) তাঁর বইয়ে হিলির স্থানীয় অর্থনীতির ওপর দেশভাগের মন্দ প্রভাবের কথা বলেন এবং বড় পরিসরে কী করে মুসলমানদের প্রতি অবিচার করা হয়েছিল তা-ও বলেন। কিন্তু ধাঁধার উত্তর মেলে না। তিনি বর্ডার পুনর্নির্ধারণ বিষয়ে কিছুই বলেননি; এমন কোনো ঘটনার কথাও বলেননি, যেখানে লোকে তদবিরের জন্য তাঁর কাছে ধরনা দিয়েছিল; এমনকি বর্ডার নিয়ে হিন্দু-মুসলমানের

পরস্পরবিরোধী মনোভঙ্গি নিয়েও চৌধুরী কিছু বলেননি। যুক্তির খাতিরে যদি ধরেও নিই যে, সীমান্তের স্থানবদল ঘটেছিল, তাহলেও একথা প্রমাণের কোনো উপায় নেই যে, মানুষজন কোনো না কোনো পর্যায়ে তাঁর কাছে গিয়েছিল কিংবা তার ভিত্তিতে তিনি কোনো উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কংগ্রেসের একজন থানা পর্যায়ী নেতা হিসেবে তিনি কী-ই বা খুব একটা করতে পারতেন? মানুষের আরজি বড়জোর দলের উচ্চপর্যায়ের কাছে পৌঁছে দিতে পারতেন; হিলি ও বালুরঘাটকে দ্বিখণ্ডিত করে যদি কোনো 'নোশ্যনাল বাউন্ডারি' ঠিক করা হয়ে থাকত, তাহলে তাঁর এবং হিলির অন্য কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তি, যথা–ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জমিদার ব্রজরাখাল মজুমদারের হয়তো সুযোগ ঘটত সেই খসড়া করার প্রক্রিয়াতে অংশ নেবার। হিলিতে আদৌ এমন কিছু ঘটেছিল কি না, মানুষজনের বিবরণী থেকে সে বিষয়ে কিছু জানা যায় না। মানুষজন আবছা আবছাভাবে একটা মিটিংয়ের কথা বলে বটে, কিন্তু সেই মিটিং কোথায় হয়েছিল, দিল্লি নাকি বালুরঘাটে, সে বিষয়েও কোনো সুনির্দিষ্ট উত্তর মেলে না।

এটা হতেই পারে যে, সীমান্তের স্থানবদলের কোনো ঘটনা হিলিতে ঘটেনি; কিংবা ঘটলেও লোকে তাদের হয়ে তদবিরের জন্য চৌধুরীকে গিয়ে ধরেনি; আর যদি লোকজন গিয়েও থাকে, তারপরও নিশ্চিত করে বলার উপায় নেই যে, তারা তাঁর কাছে ঠিক কী চেয়েছে, আর চৌধুরীই বা আদতে কী ভূমিকা নিয়েছিলেন, কেন নিয়েছিলেন। স্থানীয় মানুষজনই গল্পটাকে আজগুবি মনে করে, গুজব বলে একপাশে ঠেলে সরিয়ে রাখে। প্রশ্ন হলো, এতসব যদি এবং কিন্তু সমেত, অনিশ্চয়তা এবং সন্দেহ সমেত, এই গল্প কিভাবে এত ব্যাপক মাত্রায় চালু রইল, যেখানে সমাজের সকলেই এ বিষয়ে কমবেশি জ্ঞাত?

দেশভাগের প্রক্রিয়াটি মোটেই নিছক টেকনিক্যাল ছিল না, বরং তার সাথে ভীষণভাবে মিশে ছিল রাজনৈতিক তদবির আর দর-কষাকষি;

২.২ গুজব বিষয়ে...

ঔপনিবেশিক ভারতের কৃষক বিদ্রোহের নানা দিক আলোচনা করতে গিয়ে রণজিৎ গুহ (১৯৮৩: ২২০-২৭৭) দেখান যে, জনবাদী উত্থান ছড়িয়ে দেবার (Transmission) এক অমোঘ অস্ত্র হলো গুজব। গুহর মতে, গুজব পরিস্থিতিকে উস্কে দেয় এবং সঞ্চালিত করে। সাধারণভাবে গুজবকে দেখা হয় কৃষকের অযৌক্তিকতার স্মারক হিসেবে। এর বিপরীতে গুহ গুজবের মাঝে কৃষকের রাজনৈতিক চিন্তার ছাপ দেখতে পান। তাঁর মতে, গুজবের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো : গুজবের উৎসের নামহীনতা; তার সামষ্টিক ঐক্য গড়ে তুলবার ক্ষমতা; তার 'অনিয়ন্ত্রণযোগ্য' শক্তি এবং তার ছড়িয়ে পড়তে পারা। বীণা দাসের মতে, গুহর 'ছড়িয়ে পড়া'র ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে হোমি ভাভা (১৯৯৪: ২৮৩-৩০২) গুজবের একটা সাধারণ তত্ত্ব তৈরিতে মনোযোগ দেন। তিনি গুজবের দুটো প্রেক্ষিতকে পৃথক করেন–এক, তার বলাবলির/ঘোষণার (enunciative) প্রেক্ষিত; আর দুই, সম্পাদনমূলক (performative) প্রেক্ষিত। ভাভার মতে, গুজবের অনির্ধারণীয়তা সামাজিক ডিসকোর্সে তাকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে; গুজবের বলাবলির/ঘোষণার প্রেক্ষিতের মাঝে নিহিত থাকে আন্তসাবজেকটিভ, সম্প্রদায়গত বন্ধন; আর তার ছড়িয়ে দেবার সম্পাদনমূলক ক্ষমতা প্রকাশিত হয় সংক্রামক বিস্তৃতির মধ্যে।

এবার আমাদের গল্পটায় ফিরে যাওয়া যাক। যতদূর পর্যন্তই খোঁড়াখুঁড়ি করা হোক না কেন, গল্পের উৎস থেকে যাবে নামহীন, সে কারণেই অশনাক্তযোগ্য। সে কারণেই গল্পটি হয়ে ওঠে সামষ্টিক, হয়ে ওঠে সামাজিক ডিসকোর্স। কেউ এমনকি জানেনও না আসলে কী হয়েছিল; কিন্তু সম্প্রদায় সামষ্টিকভাবে গল্পটা বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। এবং সর্বোপরি, তাড়না বা গুজবের সম্পাদনমূলক প্রেক্ষিতটি তাকে ছড়াতেই থাকে। গুহ বিদ্রোহ দানা বাঁধবার পরিপ্রেক্ষিতে গুজবকে শনাক্ত করেছেন একটা হাতিয়ার হিসেবে, যা ছড়িয়ে যাবার মধ্য দিয়ে বিদ্রোহের সলতেয় আগুন জ্বালায়। আমার কাজেও মানুষের ক্ষোভ আর হতাশার প্রকাশ হিসেবে গুজবকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা, তাকে ছড়িয়ে দেবার ধারণাটি রয়েছে। পরিপ্রেক্ষিত হিসেবে এখানে বিদ্রোহ অনুপস্থিত; কিন্তু জেমস স্কট (১৯৮৫) যেমন করে জনবাদী প্রতিরোধের প্রাত্যহিক ধরনকে দেখেছিলেন, আমি গুজবকে তারই একটা নিদর্শন হিসেবে দেখতে পাই। হিলির মুসলমানরা ভাবে যে, তাদেরকে 'চতুর' হিন্দুদের কাছে ঐতিহাসিক পরাজয় মেনে নিতে হয়েছিল, যা তারা কখনোই তাদের অস্তিত্ব থেকে খুলে ফেলতে পারেনি। যে ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে তাদেরকে চিরকাল থাকতে হবে, তার ছকটা উন্মোচন করা, সেটা মুখে মুখে ছড়িয়ে দেওয়া ছাড়া আর কী-ই বা তারা করতে পারে?

গুজব বিষয়ে উল্লিখিত পূর্বসূরীদের অবদান স্বীকার করে নিয়ে বীণা দাস (২০০৭: ১১৭-১৯) গুজব ছড়ানোর আবশ্যিক ব্যকরণগত বৈশিষ্ট্যের ওপর জোর দেন। দাসের মতে, এলিট ডিসকোর্সে ছোঁয়াচ আর সংক্রমণ দিয়ে গুজবকে বোঝা হয়, যা ভাষাকেই বদলে দেয়। যোগাযোগের মাধ্যমের বদলে ভাষা স্বয়ং হয়ে ওঠে যোগাযোগক্ষম, হয়ে ওঠে ছোঁয়াচে/সংক্রামক; এমনভাবে নানা কিছু ঘটাতে থাকে, যেন বা তা প্রাকৃতিক। দাস (পূর্বোক্ত: ১৩৪) যুক্তি দেন, "অন্যের ব্যাপারে আমার ভয় রূপান্তরিত হয় এই ধারণায় যে অন্য হলো ভীতিকর...এহেন রূপান্তরণ যে ধারণার সাথে বাঁধা তা হলো অতীতের গুরুতর ঘটনাগুলো 'অসমাপ্ত' এবং তা বর্তমানকে নতুন এবং অপ্রত্যাশিত পথে ঘুরিয়ে দিতে সক্ষম...অতীত কেবল অনির্ণীতই নয় বরং...বর্তমানও হয়ে উঠতে পারে সেই ক্ষেত্র, যেখানে অতীতের একটি পাকাপোক্ত বোঝাবুঝিতে সমন্বিত হতে না পারার অর্থে অতীতের উপাদানগুলো প্রত্যাখ্যাত হয়েছে...।" বর্তমানের বাস্তবতায় এতে নতুন অর্থ তৈরি হয়, বিদ্যমান প্রতীকময়তা আর অর্থের ভেতরে ছিদ্র তৈরি হয়। আমি মনে করি, এই অনুচ্ছেদটি যা বলার তার সবটুকু বলে দিয়েছে। চৌধুরীর সামাজিক মর্যাদা ধূলিসাৎ করা কিংবা তাঁকে মহিমান্বিত করা, কোনোটিই আমার লক্ষ্য ছিল না। অতীতে আসলে কী ঘটে থাকতে পারে, সে বিষয়ে কিছু সম্ভাব্য ব্যাখ্যাকে একপাশে রেখে, আমি বরং বেশি আগ্রহী বর্তমানে এই গল্প/গুজবটির প্রাসঙ্গিকতা বুঝতে। দাসের বলা 'অন্যের ব্যাপারে ভয়'-এর মতো এই ক্ষেত্রেও আমি দেখতে পাই 'অন্য'র ব্যাপারে সন্দেহ কী করে চৌধুরীকে সন্দেহভাজন বানিয়ে দিল কিংবা হিন্দুদেরকে বানিয়ে দিল অবিশ্বস্ত সম্প্রদায়। নিয়তির পরিহাস হলো এই যে, চৌধুরী স্বয়ং তাঁর লেখায় দেশভাগ কী করে হিলি কিংবা অন্যত্র মুসলমানের জন্য দুর্গতি বয়ে এনেছে, সে কথা বলেছেন। অতীত কী করে বর্তমানে জিইয়ে থাকে গুজবের মধ্য দিয়ে, চৌধুরীর গল্পটি হতে পারে তার একটি দারুণ নজির; অন্যকে ভয় পাবার প্রসঙ্গে দাস যা বলেছিলেন, তার আরো একটি দৃষ্টান্ত দেখা গেল, যেখানে 'অন্য' হিন্দু হয়ে উঠল ভীতিকর।

২.৩ ঠকে যাবার গল্প, হেরে যাবার গল্প

"...একদল মাদ্রাজী ফৌজ ছিলো বৃটিশের, হিলিতে, নয়শ'। রেল বসাতো...লুটপাট হলে তাতে বাধা দিতো। অভাবে মানুষ

বড়লোকদের লুট করতো। সেই জন্যেই তারা এখানে ছিলো...মাদ্রাজী ফোর্স, মুসলমান, নয়শ' ছিলো তারা। তারা বললো, 'তোমরা ফ্ল্যাগ নামায়ো না; বৃটিশ আমাদের যে অস্ত্র দিসে, সেই অস্ত্রে ছয়মাস আমরা যুদ্ধ করবো...।' তখন এইখানকার নেতারা মিটিং করে বোয়ালদাড়ে। তখন মেহের খান ছিলো সেইখানে, চেয়ারম্যান। সেই মেহের খান তখন বললো, 'এরা ছয়মাস যুদ্ধ করবে, বললো। কিন্তু এরা হলো ইন্ডিয়ার লোক, মাদ্রাজের লোক, এরা চলে যাবে, তখন আমাদের কি হবে? ওরা (ভারত/হিন্দু) যে নেবে দখল করে, ওদের ফোর্স, সৈন্য সামন্ত বেশী। মুসলমানদের ফোর্স বেশী ছিলো না সে যুগে, অল্প কিছু ছিলো। এরা ওদের সাথে পারবে না, আর আমরা অস্ত্র পাবো কোথায়, যে আমরা ওদের সাথে লড়বো? তো ওর বদল ফ্ল্যাগ নামায়ে দাও, ওরা নিয়ে নিক। আমরা...যেখান দিয়ে ম্যাপে আছে, আমরা সেখান দিয়ে নেবো।' এর বাদে, লোকে মেনে নিলো।" (রজব শেখের কথা থেকে অনুলিখন)

রজবের মতে, ফ্ল্যাগ নামিয়েছিলেন আফতাব উদ্দিন চৌধুরী আর পেশোয়ারী মৌলবী। এই আলাপের উপসংহারে তিনি আরেকটি তথ্য যোগ করতে ভোলেননি; সেটি হলো দেশভাগ-উত্তর হিলিতে চৌধুরী কখনোই কোনো নির্বাচনে জেতেননি। *"কিন্তু কেন?"* তিনি বলেন, *"ঐ যে, ফ্ল্যাগ নামিয়ে দিলো পরে...এরা (জনগণ) বললো যে আমরা মরতুক, মরতুক...।"*

এই গল্প আর কারো জবানিতে আসেনি। এত বছর আগে আদৌ এরকম কিছু ঘটেছে নাকি ঘটেনি, সেটা বড় কথা নয়। যে প্রশ্নটি বরং আগ্রহোদ্দীপক হতে পারে, তা হলো রজব কেন এই গল্পটি সামনে আনলেন? কী বার্তা লুকানো আছে এই গল্পের ভেতর? অন্য গল্পগুলোর তুলনায় নানা অর্থেই এই গল্পটি ভিন্ন। এখানে আমরা নতুন একসারি পাত্র-পাত্রী পাই; নতুন সম্পর্ক, নতুন প্লট পাই, যাদের কথা অন্য কেউ বলেননি। বর্ডার তৈরি বিষয়ক অপরাপর গল্পে সাধারণত 'অন্য'কে, এই ক্ষেত্রে স্থানীয় হিন্দুদেরকে, দায়ী করার একটি প্রসঙ্গ আসে। কিছু ক্ষেত্রে হিন্দু নেতৃত্ব, এমনকি ব্রিটিশদেরকেও 'অন্য' হিসেবে দাঁড় করানো হয়। অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক হাফিজুদ্দিন, নিজের মতো করে বর্ডার পুনর্নির্ধারণের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বিভিন্ন বইপত্র থেকে জেনেছেন যে, মাউন্টব্যাটেনের সাথে নেহরুর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। আর হাফিজুদ্দিন মনে করেন, ওই সম্পর্কের কারণেই, 'তারা' চৌদ্দটা রাইস মিল ছেড়ে দিতে চায়নি। তাঁর এই 'তারা'র ব্যবহার লক্ষণীয়; এই 'তারা' হতে পারে স্থানীয় হিন্দু, নেহরু, কিংবা মাউন্টব্যাটেন; কিংবা হতে পারে এদের সকলেই, যারা হিলি মুসলমানের বিপরীতে 'অন্য'। যদিও রজব শেখের গল্পও 'নিজ-অন্য'র দ্বৈততার ওপরে ভর করে দাঁড়ানো, তবে অন্যগুলোর মতো করে এটি ঠিক দোষ চাপিয়ে ক্ষান্ত দেয় না। বরং এটি 'নিজ'কে সংগঠিত করতে সম্প্রদায়ের উদ্যোগকে, তাদের চিন্তা ও তৎপরতাকে দেখায়; প্রতিরোধের সম্ভাবনা দেখায়, যদিও তা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়েছিল। 'নিজ' হার মেনেছিল, পিছু হটেছিল, অধিকতর শক্তিশালী 'অন্য', ভারত নামক রাষ্ট্রের সাথে যুদ্ধে জড়াবার সম্ভাব্য বাস্তবতা বিবেচনা করে। আর সেই 'পিছু হটা' আজ অব্দি শেষ হয়নি; তা প্রবলভাবে বেঁচে আছে নালিশের মধ্য দিয়ে।

এই পর্যায়ে এসে আমি সম্ভবত বুঝতে পারছি যে, এই গল্পগুলো কোত্থেকে আসে। তারা সম্ভবত উৎসারিত হয়, জন্ম নেয়, অবয়ব পায়, হারানোর, ঠকবার, বিশ্বাসভঙ্গের নিরন্তর অনুভূতি থেকে। যা তারা হারিয়েছে, যে ক্ষতি হয়েছে, তা অপূরণীয়; রাষ্ট্র গঠনের একটা দুর্বোধ্য প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পাক-হিলির লোকদের বন্দর, রাইস মিলসহ একটি বিশাল এলাকা ছেড়ে দিতে হয়েছে; যা সমৃদ্ধতর বাকি অর্ধেক হিলির সাথে ভারতের মধ্যে পড়েছে। এই হারানোর সাথে তাদেরকে হারাতে হয় মর্যাদা, তৈরি হয় লজ্জা, *"...তারা যে এতখানি জায়গা নিয়ে গেলো, আমরা বুঝতেই পারিনি।"* বুঝতে পারি এই শেষোক্ত অনুভূতি থেকে জন্ম নেয় অসহায় ক্রোধ, যা ঘটনার শিকার মানুষজনকে ক্রমাগত ঠেলতে থাকে আড়ালে ঘটে যাওয়া সম্ভাব্য ষড়যন্ত্র উন্মোচন করবার জন্য। আর এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই অযৌক্তিক/অসম্ভব আর যৌক্তিক/সম্ভব-এর ভেদরেখাটা সময় সময় অস্পষ্ট হয়ে যায়।

> স্থানীয় মানুষজনই গল্পটাকে আজগুবি মনে করে, গুজব বলে একপাশে ঠেলে সরিয়ে রাখে। প্রশ্ন হলো, এতসব যদি এবং কিন্তু সমেত, অনিশ্চয়তা এবং সন্দেহ সমেত, এই গল্প কিভাবে এত ব্যাপক মাত্রায় চালু রইল, যেখানে সমাজের সকলেই এ বিষয়ে কমবেশি জ্ঞাত?

২.৪ পাঁচ আনা আর এগারো আনার গল্প

"...ওরা, হিন্দুরা ছিলো চালাক, ওরা জানতো, 'আমাদের এই জায়গা লাগবে; তারা [পাকিস্তানের লোকেরা] রেললাইনটা পর্যন্ত তাদের দিকে পেয়ে গেছে; যদি একবার খালি আক্রমণ করা যেতো'...তারা (হিন্দুরা) আস্তে আস্তে বর্ডারটাকে প্ল্যাটফর্ম পর্যন্ত (এখনকার জায়গায়) নিয়ে আসলো...কিন্তু আসলে সীমানা ছিলো আরো অনেক ভিতরে। যখন মুসলমানেরা পাকিস্তানের জন্য হৈ চৈ শুরু করে দিলো, তখন মাউন্টব্যাটেন আর র‍্যাডক্লিফ বললো, 'তোমরা বালুরঘাটে অপেক্ষা করো, আমরা তোমাদের দু'জনকে দু'টা কাগজ দেবো..."

মোনেম খন্দকারের মতে, মাউন্টব্যাটেন আর র‍্যাডক্লিফের দেশ ছেড়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। কেননা হিন্দুদের গড়ে তোলা স্বাধীনতা আন্দোলন তখন ছিল তুঙ্গে। এদিকে মুসলমানরাও পাকিস্তানের দাবি করছিল। মোনেম বলতে চান, বালুরঘাট হয়ে চলে যাবার পথে মাউন্টব্যাটেন আর র‍্যাডক্লিফ দুই টুকরো কাগজ দিয়ে যান আফতাব উদ্দিন চৌধুরী আর ব্রজরাখাল মজুমদারের হাতে, যাঁরা যথাক্রমে হিলির মুসলমান এবং হিন্দুর প্রতিনিধিত্ব করছিলেন।

"...কাগজ দু'টো খোলার পর তাঁরা দেখলেন, একটিতে লেখা আছে ১১ আনা আরেকটিতে লেখা ৫ আনা...কাগজে লেখা আছে পাকিস্তানের জন্য ৫ আনা আর ভারতের জন্য ১১ আনা। হিন্দুরা সংখ্যায় বেশী, তাই ওদের জন্য ১১ আনা আর তখন থেকেই সীমান্ত তৈরি হলো।"

মোনেম মোটামুটি নিশ্চিত যে, দুই রাষ্ট্রের জন্য যে অনুপাতে এলাকার ভাগাভাগি হয়েছিল, সেটা জনসংখ্যার হিসাবে ঠিকই আছে। তিনি আরও বলেন যে, জিন্না সাহেব ওই ৫ আনাই মেনে নিলেন আর বললেন, এই তাঁদের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু যে বিষয়টি নিয়ে মোনেম খুশি নন, সেটি হলো, স্থানীয় হিন্দুরা যেভাবে হিলি রেলস্টেশন সংলগ্ন রেললাইন পর্যন্ত তাদের সীমানাকে বাড়িয়ে নিয়েছিল। অন্যত্র তিনি বর্ডার পুনর্নির্ধারণ নিয়ে বলেন :

"বালুরঘাট থেকে হিলি আসবার পথে, কিছুটা পথের পরে...বালুরঘাট থেকে হিলি মোট হলো ১৮ ক্রোশ, তার ৯ ক্রোশের পরে একটা নদী আছে, তখন সেটাই ছিলো সীমান্ত। হিন্দুরা ছিলো চালাক; ওরা আমাদেরকে বুঝতে দেয়নি। মুসলমানেরা বোকা, শুধু শুধু মাথাগরম করে।"

মোনেমের এই গল্পে স্থানীয় এবং কেন্দ্রীয় রাজনীতির যে যোগসূত্র তিনি দেখান, সেই জায়গাটাই হলো অবাস্তব, যুক্তি-বুদ্ধির বাইরে। তিনি হিলির বর্ডার কিভাবে তৈরি হলো সেকথা বলতে গিয়ে হঠাৎই লাফ দিয়ে চলে যান দেশভাগের বড় প্রেক্ষিতে। তাঁর নুয়ে পড়া বয়স আর বিস্মৃতি বিবেচনায় রাখলে, এই বিচ্যুতি বোধগম্য। আবার ব্যাপারটা এমনও হতে পারে যে, মানুষজন ইতিহাসের জমা-খরচ খতিয়ান নিতে গিয়ে তাদের স্থানিক পরিসরের লাভ-ক্ষতির সাথে কেন্দ্রীয় পরিসরের ঘটনা আর কর্তাব্যক্তিদের সম্পর্কিত করছে। তাদের এলাকায়, তাদের জীবনে যা ঘটে গেছে তার সাথে তারা কি 'উচ্চতর' রাজনৈতিক অঙ্গনে যা ঘটেছে, তার যোগাযোগ দেখতে পায়? আমি অবাক হয়ে দেখছিলাম, স্থানীয় নেতৃবর্গ মনে করতেন মোনেম হোঁচট খাচ্ছিলেন, অথচ অনায়াসে উল্লেখ করছিলেন বাউন্ডারি কমিশনের চেয়ারম্যানের নাম, যিনি মাত্র কয়েক সপ্তাহ ভারতে ছিলেন। ভাবতে অবাক লাগে, বড় ইতিহাস কী করে তৃণমূলের আমজনতার মগজের মধ্যে বসত করে! মোনেমের গল্পটা একেবারেই অবাস্তব এই অর্থে যে, মাউন্টব্যাটেন আর র‍্যাডক্লিফ বালুরঘাট দিয়ে পার হয়েছিলেন আর যাবার সময় কিছু নথিপত্র সেখানে দিয়ে গেছিলেন; অথবা মজুমদার কিংবা চৌধুরীর মতো স্থানীয় নেতাদের পক্ষে আদৌ কোনোভাবে সম্ভব ছিল উল্লিখিত রাঘব বোয়ালদের নাগাল পাবার। কিন্তু গল্পের এই অবাস্তব সাক্ষাৎপর্বটুকু বাদ দিলে যা তিনি বলেন, তা হলো, ব্রিটিশরা মুসলমানদের দিয়েছে পাঁচ আনা আর হিন্দুদের দিয়েছে এগারো আনা। এই গল্পে এবং গল্পের বাইরে, মোনেম স্বীকার করেন যে, স্বাধীনতা আন্দোলনে হিন্দুদের অগ্রগণ্য ভূমিকা ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর বদ্ধমূল বিশ্বাস যে, স্থানীয় হিন্দুরা ছিল বেজায় চালাক; শুধু শুধু মাথা গরম করা মুসলমানদের ধোঁকা দেওয়া তাদের জন্য কোনো ব্যাপারই ছিল না। মোনেমের গল্পের অবাস্তবতা, আমি যেমনটা দেখতে পাই, সম্প্রদায়সমূহ, নতুন জন্ম নেওয়া জাতি ও রাষ্ট্র, এমনকি ঔপনিবেশিক প্রশাসকদের মধ্যকার জটিল সম্পর্ককে ঘিরে বেড়ে ওঠে।

এবং এখনো যদি কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে, আসলেই সেখানে বর্ডার পুনর্নির্ধারণ-এর কোনো ঘটনা ঘটেছিল কি না, আমার স্বীকার করতে হবে যে, 'আমি জানি না'; এবং এও মানতে হবে যে, যা কিছু বিবরণী আমি পেয়েছি, তার ভিত্তিতে উত্তরটা 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' যেকোনোটাই হতে পারে।

৩. যে ক্ষত আজও পোড়ায়

এই আলোচনার ইতি টানতে গেলে যে প্রশ্নের সুরাহা হওয়া জরুরি সেটা হলো, অসম্পূর্ণ, তথ্যগতভাবে ভুলে ভরা এইসব গল্প আমাদেরকে কী দেবে? ব্যক্তিক ও সামষ্টিক বিস্মৃতিতে ভোগা, ব্যক্তির পছন্দ-অপছন্দ আর সম্প্রদায়ের দাবি দিয়ে সাজানো গল্পগুলো এসবের বাইরে আমাদেরকে আর কী-ই বা দিতে পারবে? তারা কি আমাদেরকে কোনো সত্য জানাতে পারে? তারা কি আমাদেরকে কোনো নির্দিষ্ট ঘটনার নথিকরণে সাহায্য করতে পারে? নাকি তারা আমাদেরকে একটি বিশেষ বর্তমানে প্রবলভাবে বিরাজমান কোনো অতীত বিশেষের বোঝাবুঝিতে আলো ফেলতে পারে? হিলিতে বর্ডার তৈরির সময়ে আসলে কী ঘটেছিল, সে বিষয়ে আমার ফিল্ডওয়ার্কের মাঝপথে আমি রীতিমতো ধন্দে ছিলাম। এবং এখনো যদি কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে, আসলেই সেখানে বর্ডার পুনর্নির্ধারণ-এর কোনো ঘটনা ঘটেছিল কি না, আমার স্বীকার করতে হবে যে, 'আমি জানি না'; এবং এও মানতে হবে যে, যা কিছু বিবরণী আমি পেয়েছি, তার ভিত্তিতে উত্তরটা 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' যেকোনোটাই হতে পারে। আমার সময়ের টানাটানি ছিল এবং সে কারণেই এই সম্ভবনার জায়গা আমার খোলা রাখতে হয়েছে যে, আমার নাগালের বাইরেও প্রমাণাদি থেকে থাকতে পারে, যা এই বিশেষ বিষয়ে আলোকপাত করতে পারে। কিন্তু আমার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটি হলো, হিলিতে মানুষজনের একটা বড় অংশ আজও বিশ্বাস করে যে, বর্ডার রচনার বিষয়টি এমনভাবেই হিলিতে ঘটেছিল। কেউ কি হিলির এমন একটি অংশে পাকিস্তানি পতাকা উঠিয়েছিলেন, যা পরে ভারতের ভেতরে চলে যায়?

আর এমনটি ঘটে থাকলে, সেই জায়গার নামটি কী, তার অবস্থানই বা কোথায়? পতাকাটি কতদিন উড়েছিল? হিলির হিন্দুদের তরফ থেকে বর্ডার পুনর্নির্ধারণের কোনো ষড়যন্ত্র কি হয়েছিল? স্থানীয় কোনো মুসলমান নেতা কি সেই ষড়যন্ত্রে অংশীদার ছিলেন? এসব প্রশ্নের উত্তর কী, তাতে খুব একটা কিছু যায়-আসে না এবং সব ক্ষেত্রেই উত্তর হবার কথা একাধিক। কিন্তু মানুষজন বিশ্বাস করে যে তাদেরকে তাদের প্রাপ্য অংশ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। সীমান্তের উভয় দিকে 'নিজ' এবং 'অন্য'র মাঝে নিরন্তর দর-কষাকষির যে প্রক্রিয়া চলমান, তার মধ্য দিয়েই এই বিশ্বাসগুলো পোক্ত হয়। তারা বিশ্বাস করে যে, ওটি ছিল তাদের ঐতিহাসিক পরাজয়। একজন যেমনটি বলছিলেন, *"এই বর্ডার তারা আমাদের ওপরে চাপায়ে দিসে, আমরা তো এইটা চাইনি।"*

আমার কাছে মানুষজনের এই বিশ্বাস আর তার বিবরণী–অতীতের 'সত্য' ঘটনার চাইতে অনেক অনেক গুণ বেশি সত্য। অতীতের 'সত্য' ঘটনা বলতে আমি বোঝাতে চেয়েছি সত্যর স্বতঃসিদ্ধ বৈশিষ্ট্যের কথা। আমার অতীত অনুসন্ধান স্বতঃসিদ্ধ কোনো অতীত উদ্‌ঘাটনে নিবেদিত নয়; বিস্মৃতির ধুলো সরিয়ে কোনো ফসিল উদ্ধারে আমার আগ্রহ নেই। আলনসো ইতিহাস রচনার চর্চায় ঐতিহাসিক তৎপরতাকে বস্তুনিষ্ঠ, স্বচ্ছ, 'স্বতঃসিদ্ধ', 'যেমনটি আসলে ঘটেছিল'[৬], এভাবে দেখাবার প্রবণতার কথা বলেন (আলোনসো, ১৯৯৮: ৩৩-৫৭)। তিনি যুক্তি দেন যে, এর মধ্য দিয়ে ইতিহাস রচনাসমূহ নিজেদের ব্যাখ্যাকে আড়াল করে, বিশুদ্ধ বাস্তবতার একটা মায়াজগৎ তৈরি করে। তাঁর যুক্তি ধরে এগিয়ে আমি দেখতে পাই যে, অতীত হলো জ্যান্ত, যা প্রবহমান, পরিবর্তনশীল বর্তমানের সাথে সম্পর্কের মধ্য দিয়ে নিরন্তর পরিমার্জিত হচ্ছে। আমি দেখতে পাই, হিলির জ্যান্ত অতীত (সমূহ) গুজবের আন্তসাবজেকটিভ রূপায়ণের মধ্য দিয়ে হিলির বর্তমান (সমূহ)- এর সাথে গাঁথা; আর তাই গুজবগুলো অবাস্তব, আজগুবি, অসম্পূর্ণ, ত্রুটিপূর্ণ হলেও সত্য।

সাঈদ ফেরদৌস: অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল: sferdous70@gmail.com

*এই লেখাটির একটি ইংরেজি সংস্করণ ভিন্ন শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্রের The Journal of Social Studies-এর ১৪৬তম সংখ্যায় (এপ্রিল-জুন ২০১৫, পৃ. ২৫-৪৪); পুনর্মুদ্রণের অনুমতি দেওয়ায় এবং 'সর্বজনকথা' তা ছাপতে আগ্রহী হওয়ায় আমি উভয় পত্রিকার সম্পাদকের কাছেই কৃতজ্ঞ।

টীকাঃ

১) এক্ষেত্রে মাউন্টব্যাটেনের মাথাব্যাথা ছিলো সরকারের ভাবমূর্তি নিয়ে, যাতে করে বৃটিশদের প্রতি মানুষের ঘৃণাটা, নজরটা অন্য দিকে ঘোরানো যায়; ভাগাভাগি নিয়ে স্থানিক পর্যায়ের হতাশা একদিনের জন্য হলেও যেন পিছিয়ে দেওয়া যায়, যাতে করে স্বাধীনতা উদযাপনের আনন্দটুকুই মূখ্য হয়ে উঠবে। দেখুন, Van Schendel পূর্বোক্ত; পাদটীকা ২৪, পৃঃ ৫১-২; আরো দেখুন, Chatterji পূর্বোক্ত; পৃঃ ১৯৫।

২) বড় থেকে ছোট, এই ক্রমানুসারে সাজালে এককগুলো হবে, প্রদেশ, বিভাগ, জেলা, মহকুমা, থানা, ইউনিয়ন; কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি ইউনিয়ন গঠিত হয়। এক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন যে, দেশভাগের সময়ে থানা ছিলো পুরোপুরি পুলিশের নিয়ন্ত্রণাধীন; ১৯৬১-র পরেই কেবল থানা পর্যায়ে প্রাদেশিক সরকারের উন্নয়ন দপ্তরগুলোর শাখা বিস্তৃত হয়; দেখুন, 'Thana' in Asiatic Society of Bangladesh Banglapaedia, http://www.banglapedia.info/HT/T_0154.htm; ২০-০৩-২০১৪ তারিখে দেখা হয়েছে।

৩) যদিও কমিশনার সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মূল্যায়ন রয়েছে; চেস্টারের মতে, অদক্ষতা নয়, বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি তার আনুগত্য, সেই পক্ষে তার সংশ্লিষ্টতা তার কাজে ছাপ ফেলেছিলো। চেস্টার (২০০৯) এও মনে করেন যে, র‍্যাডক্লিফ তার বাকী জীবনজুড়ে কৃতকর্মের জন্য ভুগেছিলেন যদিও তা পাঞ্জাবের মানুষের ভোগান্তি তুলনায় হয়তো কিছুই নয়। কাজেকাজেই দেখা যাচ্ছে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিটি সম্পর্কে মতভিন্নতা থাকলেও চ্যাটার্জী এবং চেস্টার উভয়েই বর্ডার তৈরির ভয়াবহ পরিণতি বিষয়ে মোটের ওপর এক জায়গাতেই ছিলেন।

৪) পরবর্তী বছরগুলোতে ঠিক তাই ঘটেছিলো; ভারত আর পাকিস্থানকে অজ্ঞানতা আর অনভিজ্ঞতাপ্রসূত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য বারংবার বসতে হয়েছিলো।

৫) এটি চ্যাটার্জীর নিছক একটি দাবী মাত্র ছিলোনা। তার "Fashioning of the Frontier" লেখাটি জুড়েই কমিশনের অদক্ষতা/অনভিজ্ঞতার নজীর রয়েছে; আলোচনা রয়েছে, কিভাবে বড়লাট নেহেরুর কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে কমিশনের কাজের দফায় দফায় হস্তক্ষেপ করেছেন; আর এসব-ই দেখায় কমিশন কি করে দলনিরপেক্ষভাবে কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছে। যদিও পাঞ্জাবের বর্ডার-রচনা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে চেস্টার সিরিল র‍্যাডক্লিফ প্রসঙ্গে ভিন্ন মূল্যায়ন দাঁড় করিয়েছেন। র‍্যাডক্লিফ তার বিবেচনায় কেবল একজন বৃটেনের নিবেদিতপ্রাণ কর্মচারী-ই ছিলেন না, বরং যুদ্ধকালীন সময়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ে কাজ করার সুবাদে ভারত সম্পর্কে তার কিছু ধারণাও ছিলো বটে।

৬) মেক্সিকান পরিপ্রেক্ষিতে আলোনসো দেখান যে, অতীতের পরিবেশনা কিভাবে সম্প্রদায়ের কল্পনা দাঁর করাতে ভূমিকা রাখে; আর সামাজিক স্মৃতি সামাজিক অর্থ তৈরির জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

গ্রন্থপুঞ্জী

চৌধুরী, আফতাব উদ্দিন (১৯৭০ (১৩৭৭ বাং)),অতীতের কথা, পাকহিলি, দিনাজপুর।

[আলোনসো, ১৯৯৮] Alonso, Ana Maria (1998), "The Effects of the Truth: Re-presentatioms of the Past and the Imagining of Community," Journal of Historical Sciology, vol. 1 no. 1, March, pp. 33-57.

[আজাদ, ১৯৮৮ (১৯৫৯)] Azad, Maulana A. K. (1988(1959)), India Wins Freedom, New Delhi: Orient Longman.

[এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩] Asiatic Society of Bangladesh (2003) , Banglapaedia, available at http://www.banglapedia.info /HT/T_0154.htm.

[গুহ, ১৯৮৩] Guha, Ranajit (1983), Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India, Delhi: Oxford University Press.

[চেস্টার, ২০০৯] Chester, Lucy P. (2009), Borders and Conflict in South Asia, the Radcliffe Boundary Commission and the Partition of the Punjab, Manchester & New York: Manchester University Press.

[চ্যাটার্জী, ১৯৯৪] Chatterji, Joya (1994), Bengal Divided: Hindu Communalism and Partition, 1932-1947, Cambridge: Cambridge University Press.

[চ্যাটার্জী, ১৯৯৯], Chatterji, Joya (1994), The Fashioning of a Frontier: The Radcliffe Line and Bengal's Border Landscape, 1947–52. Modern Asian Studies, vol. 33, pp.185-242.

[চ্যাটার্জী, ২০০৭], Chatterji, Joya (1994), The Spoils of Partition, Cambridge: Cambridge University Press.

[জাতিসংঘ, ২০০৬] The United Nations (2006), Report of International Arbitral Awards: Boundary disputes between India and Pakistan relating to the interpretation of the report of the Bengal Boundary Commission, vol. XXI, 26 January 1950, New York: The United Nations.

[দাস, ২০০৭] Das, Veena (2007), Life and Words: Violence and the Descent into the Ordinary, London: University of California Press.

[ভবা, ১৯৯৪] Bhabha, Homi K. (1994), The Location of Culture, Routledge, London and New York, pp. 283-302.

[স্কট, ১৯৮৫] Scott, James C. (1985), The Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance, New Heaven and London: Yale University Press.

[হডসন, ২০০৭] Hodson, H. V. (2007), The Great Divide: Britain-India-Pakistan, London: Oxford University Press, 1997.

সর্বজনকথা প্রাপ্তিস্থান

আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা
কনকর্ড এম্পোরিয়াম, কাটাবন, ঢাকা
সাগর পাবলিশার্স, বেইলী রোড, ঢাকা
দেবদারু, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
মৃত্তিকা, খুলনা
বাতিঘর, চট্টগ্রাম
বইহাট, যশোর সার্কিট হাউজ রোড, যশোর
প্রমিতি, প্রেসক্লাব মার্কেট, ২য় তলা, রংপুর
পপুলার এন্টারপ্রাইজ, দিনাজপুর
চন্দন বুক পয়েন্ট, গোল্ডেন প্লাজা, সোনাদিঘীর মোড়, রাজশাহী
বইপত্র, ৯০ রাহা মেনসন, সিলেট
আজাদ অঙ্গন, ময়মনসিংহ

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা: ৫০০ টাকা
(ডাক মাশুল সহ)
যোগাযোগ: ০১৬৭০ ৮৫৭০৯৫